মাযার ভক্তের জবানবন্দী

প্রফেসর আব্দুল মুন'এম আল-জাদাভী

অনুবদ ঃ

মুহাম্মদ আফলাতুন হুসাইন

সম্পাদনায় ঃ

মুহাম্মদ মুকাম্মাল হক

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবাদকের কথা

একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার জন্য জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অসংখ্য জিন ও মানুষ আন্তরিকভাবে মহান আল্লাহর ইবাদতে মশগুলও রয়েছে।

শয়তান যেহেতু মানুষের শত্রু সেহেতু সে যুগে যুগে মানুষকে এমনভাবে প্রতারিত করছে মানুষ যেন কোনক্রমেই শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইবাদত করতে না পারে। এ জন্য শয়তান বিভিন্ন পন্থায় ভাল কাজের মধ্যে শিরক ও বিদ'আত যুক্ত করে দিয়ে আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় করে তুলে ধরেছে, যা ঘৃণ্য শিরক ও বিদ'আতের মধ্যে গণ্য। যেমনঃ কবর যিয়ারত করা সুন্নাত; কিন্তু কবরবাসীর নিকট সাহায্য প্রার্থণা করা বা তার কাছে কোন কিছু চাওয়া শিরক। কবরের তাওয়াফ করা বিদ'আত, কবরবাসীর সম্মানে যবেহ করা হারাম। কবরবাসী নবী, ওলী, পীর-দরবেশ এমনকি অন্যান্য নেককার লোকদের নামে মানত করা বা মানত আদায়ের জন্য তাদের মাযারের নিকট যাওয়া ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাজ। অথচ আমাদের সমাজে এসব কাজকে সওয়াবের কাজ মনে করা হয়।

প্রফেসর আব্দুল মুন'এম আল-জাদাভীর "إعترافات ... كنت قبوريا" (এতেরাফাত কুনতু কুবুরিয়ান) মাযার ভক্তের জবানবন্দী নামক পুস্তিকাটিতে তিনি খুব সহজ ভাষায়, সাহিত্যিক ভক্তিতে সামাজিক ও ধর্মীয় কতিপয় কুসংস্কারের আলোচনা করেছেন। যে আলোচনা মুসলিম সমাজের জন্য খুবই প্রয়োজন। আলহামদুলিল্লাহ, বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হলো, যা আমাদের সমাজে দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত কুসংস্কার, কবর পূজা, পীর পূজা, মাযার পূজার মত বিভিন্ন ধরণের শিরক ও বিদ'আত হতে মানুষকে দূরে রাখতে যথাযথ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। অন্ততঃ একজন মানুষও যদি এ বই পাঠ করে ঐসব কুসংস্কার ও শিরক-বিদ'আত হতে বাঁচতে পারে এবং শিরক ও বিদ'আত মুক্ত ইবাদতে মনযোগী হতে পারে, তবেই আমার শ্রম স্বার্থক হয়েছে বলে আত্ম প্রশান্তি লাভ করব।

'কুসংস্কার' এমন একটি সংক্রামক রোগ যা রুগীর সাথে লেগে থাকে।

'তাওহীদ' (একত্ববাদ) এর কাজ হলো প্রথমে ভেঙ্গে ফেলা...অতপর নতুনভাবে গড়ে তোলা।

কবর পূজারীর 'কবর পূজা' থেকে ফিরে আসা এত সহজ ব্যাপার নয়। 'তাওহীদ' চায় স্বচেতন দৃঢ় ইচ্ছা।

আমার এ জবানবন্দী লেখার জন্য একাধিক কারণে বারবার ইতস্ততঃ করেছি, অতপর একাধিক কারণে লেখার জন্যও অগ্রসর হয়েছি। লেখতে যাওয়া বা না যাওয়ার কারণ একটিই... এই ভেবে ভয় পেয়েছি যে শিরোনামটি কেউ পাঠ করে বলবে যে কবরপূজারীদের একজনের ভ্রান্তিতে আমাদের কি ই বা আসে যায়? কিন্তু আমার আক্বীদা শুদ্ধ হবার পূর্বে আমি যে এলাকায় বাস করতাম, সেখানকার কোন পাঠকের মনের অবস্থা এমনও তো হতে পারে যে অবস্থা আমি আমার আক্বীদা শুদ্ধ হওয়ার পূর্বে অবস্থান করেছিলাম। যারা আমার এ জবানবন্দী পড়তে তারা নিশ্চয়ই কুসংস্কারের অন্ধকার পেরিয়ে সহীহ আক্বীদার আলোতে বেরিয়ে আসবে। একমাত্র এ বিশ্বাসই আমাকে মানুষের সামনে আমার আভ্যন্তরীণ রহস্য তুলে ধরতে সাহসী করে তোলে। সত্যের পথ দেখানোই যখন উদ্দেশ্য তখন এই পুস্তিকাটি পাঠকদের কাউকে না কাউকে খাঁটি তাওহীদের দিকে পথ প্রদর্শন করবেই ইনশাআল্লাহ।

আমি মূলতঃ বড় ধরনের একজন মাযার ভক্ত ছিলাম, তাই যখনই কোন শহরে বেড়াতে যেতাম, যেখানে কোন কবর আছে অথবা পীরের মাযার রয়েছে, তখনই আমি তাওয়াফের জন্য তাড়াতাড়ি চলে যেতাম, চাই তার কেরামতি সম্বন্ধে আমি জানি বা না জানি। কখনো কখনো তাদের বিভিন্ন কেরামতি তো আমি নিজেই আবিস্কার করতাম অথবা ওসবের ধারণা পোষণ করতাম অথবা খেয়াল করতাম যেমন, আমার ছেলে যদি এ বছর পাশ করে তবে তা হলো ঐ যে মানত প্রদানের বাক্সে বিরাট অংকের টাকা ফেলেছিলাম এটা তারই ফল, আর আমার স্ত্রী যদি এবার নিরাময় লাভ করে তবে তা হলো ঐ মোটা মোটা খাসির ফলে, যা অমুক বড় পীর-ওলীর জন্য যবেহ করেছিলাম।

একটি ইসলামী ম্যাগাজিনের কাজে গিয়ে ডক্টর জামিল গাজী সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাত হয়। উক্ত ম্যাগাজিনটি কায়রোর আল আযীয বিল্লাহ সংস্থা-এর প্রচার ও প্রকাশনার কাজ করতো। যা তার কাছে অন্যান্য মসজিদসমূহকেও

সংশ্লিষ্ট করতো যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা এবং আক্বীদা সংশোধন করা। যেহেতু জামিল গাজীর সাথে আমার বার বার সাক্ষাত করতে হচ্ছিল; তাই জুম'আর নামায আমি ঐ আযীয বিল্লাহ মসজিদে পড়তে যেতাম। ডঃ জামিল একদিন অতি সাধারণভাবে অথচ অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভভাবে আমাকে আক্রমণ করে বললেনঃ এই যে, একজন মাযার ভক্ত, যা আক্বীদার ভয়ঙ্কর বিপরীত, একে তিনি আল্লাহর সাথে শিরক বলে আখ্যায়িত করে ফেললেন। বললেনঃ এটা এই জন্য যে আল্লাহর বান্দা গাফেল অবস্থায় মৃতদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

এহেন আক্রমণ আমায় ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে। আরও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তোলে সত্যতা। সত্য গাফেলদের জন্য কতই না ভীতিপ্রদ! ডঃ জামিল যদি এতটুকু করেই ক্ষান্ত হতেন তবে বিষয়টি সহজই ছিল; কিন্তু না যখনই তিনি ঐ মসজিদে খুতবাহ দিতেন তখনই বিষয়টিকে আলোচনায় না এনে ছাড়তেন না। বলতেনঃ সমাধিতে শুধু মৃত মানুষ ছাড়া কিছুই নেই। আবার কখনও কখনও কবর সম্পূর্ণ খালি থাকে। এমনকি হাড়ও থাকে না, যা না কোন উপকার করতে পারে, আর না পারে কোন ক্ষতিসাধন করতে।

প্রথমতঃ আমি হত চকিয়ে উঠেছিলাম এবং ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতি জুম'আর নামায আদায় করে অত্যন্ত দুঃখিত মনে ঘরে ফিরতাম। কিছু একটা যেন আমার বুকের উপর চেপে বসত, আমার সকল অনুভূতি এবং বোধ শক্তি অচল করে ফেলত, অতিকষ্টে এহেন অবস্থা থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করতাম ভাবতাম, আমি কি তবে দীর্ঘকাল ধরে ভ্রান্তির মধ্যেই আছি?

না কি আমার বন্ধু বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করে বাড়াবাড়ি করছেন? আমি তো বিশ্বাস করি, যে ব্যক্তি কালেমা শাহাদাত (আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু...) পাঠ করেছে তারা সবাই তো আর ছোট-খাট একটু-আধটু পাপের দরুন অথবা এক-আধটু পদস্খলনের কারণে কাফের হতে পারে না।

অন্য আর একটি বিষয় আমার হৃদয়ে দুখের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, যা তিলে-তিলে আমার শান্তিকে কুড়ে-কুড়ে খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে ডঃ জামিল আমাকে ঐ সকল মাযারওয়ালা আউলিয়াদের বিরুদ্ধে সরাসরি মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলেন। অথচ খতীবগণ মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সকাল-সন্ধ্যায় এরূপ ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছেন, যে ব্যক্তি কোন অলীকে কষ্ট দিবে সে

যেন পুত-পবিত্র আল্লাহ তায়ালার সাথেই যুদ্ধে লিপ্ত হল। আর এ অর্থে সহীহ হাদীসও রয়েছে। আমি তো কবর ও সমাধি ওয়ালাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাইনি; কেননা আমি মহামহিম আল্লাহর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।

তখন আমি ভাবলামঃ আক্রমণ প্রতিহত করার নিরাপদ পন্থা হল পাল্টা আক্রমণ করা।

সুতরাং আমি গাযালীর "এইয়াউ উলুমিদ্দীন' গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা এবং ইবনে আতা আলেকজান্ডারীর 'লাতায়েফুল মিনান' গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পড়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। ওদিকে ওলীদের নামসহ কিছু কেরামত এবং সে সব ঘটনাসহ মুখস্থ করে নিয়ে পরবর্তী জুম'আয় গেলাম। আমার ভেতরে ক্ষোভ চেপে রেখে ডঃ জামিলের নিকট সমস্ত কথাই শুনলাম। তিনি পাঠ দান শেষ করেই তাঁর বাড়িতে আমাকে তাঁর সাথে দুপুরের খাবার খেতে অনুরোধ করলেন।

তাঁকে আক্রমণ করার বাসনায় দাওয়াত কবুল করে নিলাম। খাওয়ার পর দুটি কারণকে সামনে রেখে নির্ভয়ে তাঁর প্রতি কথার বাণ ছুঁড়ে বসলাম। এর প্রথমটি হলো; আমি বেশ কিছু কেরামত মুখস্থ করেছি যা একেবারে কম নয়। দ্বিতীয়টি হলো; যেহেতু আমি তাঁরই বাড়িতে। অতএব আমার এরূপ আত্মবিশ্বাস আছে যে, তিনি তাঁর মাংসল হাতের তালু দ্বারা অবশ্যই আমাকে সোহাগ করবেন। তাঁর ঘরে খাবার খেলাম, তাঁর রোষানল হতে নিরাপদ হলাম, অতপর তাঁকে যা বললাম তার অর্থ হলোঃ আউলিয়াদের সমপর্যায়ের স্বচ্ছতা ও নির্মলতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউ তাঁদের মান অনুধাবন করতে সক্ষম হবে না, আর তাঁরাও তো আল্লাহরই উদ্দেশ্যে জীবনকে নির্মল ও উৎসর্গ করেছিলেন। সুতরাং আল্লাহ তাদের জন্য এমন সব নিদর্শন নির্দিষ্ট করেছেন, যা অন্য মানুষকে দেন নি ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডঃ জামিল অপেক্ষা করলেন। আমি ধারণা করেছিলাম তিনি বোধ হয় হয় বলার মত কিছুই পাবেন না; কিন্তু না তিনি এবার বলে ওঠলেনঃ

তুমি কি বিশ্বাস কর যে ঐ সব পীর-মাশায়েখদের কোন একজন আল্লাহর নিকট তাঁর রাসূলের চেয়ে বেশি সম্মানিত ছিলেন?

আত্মভোলাভাবে জবাব দিলামঃ না।

তবে তাদের কেউ কেউ কিভাবে পানির উপর দিয়ে হাঁটে?

অথবা শুন্যে উড়তে পারে?

অথবা পৃথিবীতে থেকে বেহেশতের ফল ছিঁড়ে? অথচ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এসব করেন নি...?

আমাকে তুষ্ট করতে অথবা আমার ফিরে আসার জন্য সম্ভবতঃ এতটুকুই যথেষ্ট ছিল; কিন্তু মনের গোঁড়ামী মাথা চাড়া দিয়ে ওঠলো, না এত সহজেই আত্মসমর্পণ করবো, এটা আমার কাছে অসম্ভব মনে হলো। গত ৩০বছর ধ রে যে ইসলামী সংস্কৃতির চর্চা করছি তা'ই ত্যাগ করব কিভাবে? এমনও তো হতে পারে যে এসব মিথ্যা, অথচ আমি মনে করছি আসলে সত্য। এসব ছাড়া আর কিছু সত্য নেই।

আমার লাইব্রেরী ভরা যে সব গ্রন্থাবলী আছে তা নতুন করে পড়ে দেখতে শুরু করি। অতপর ডঃ জামিলের নিকট ফিরে যাই আমাদের মধ্যে যে কথোপকথন শুরু হয় তা গভীর রাত পর্যন্ত চলতে থাকে। আমি ছিলাম সুফীবাদের মস্ত বড় এক আশেক্ব। কেন এরূপ ছিলাম? কারণ, আমি তাদের গজলগুলি পছন্দ করতাম এবং তাদের বাজনা ও সুরসমূহ যা জাতীয় উত্তরাধিকার মিশ্রিত এবং প্রাচীন বিভিন্ন সুরের মিশ্রন ছিল। পূর্ব দেশীয়, ফারসী, মামলুকী, কখনও বা একক আফ্রিকী তবলার বাজনা অথবা কখনও প্রবাসী মিশরীর দুঃখ ভারাক্রান্ত সুরে কান্না ভরা বিরহ গাঁথাসমূহ, যা নিঝুম রাতের শেষ প্রহরে আশেক্ব-মাশুকের অপূর্ব মিলনের কথা বলতো।

এসব সহ আরও অন্যবিধ কারণে আমি সুফবাদকে ভালো বাসতাম এবং এর প্রতি আসক্ত ছিলাম। এ পথের কুতুবদের বহু গজল আমি কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলাম; বিশেষ করে 'ইবনে ফারেদ্ব'এর গজলসমূহ। জনাব জামিলের সাথে বিরোধিতার জন্য যে অভিযোগটি মুখ্য হিসাবে ধরে নিয়েছিলাম, তা হলো জনাব জামিল নিজে এবং অনুরূপ যারা তাওহীদ-এর পথে ডাকেন, তারা দ্বীনের মধ্যে কোন প্রকার রূহ বা প্রাণ (আধ্যাত্মিকতা) রাখতে চাননা; বরং তারা দ্বীনকে খেয়াল হতে আলাদা করেন। অথচ কেরামতি ওয়ালাগণ যে স্তরে পৌঁছেছেন, তাদেরও তো ঐ পর্যন্ত পৌঁছা উচিত, যেন বুঝতে পারেন যে, কেরামতি কি জিনিস। কারণ সমুদ্র না দেখলে ঢেউ কি তা কেউ বুঝতে পারবে না। আর

প্রেমানলে না জ্বলে কেউ এশক্ব কি তা বুঝতে পারবে না। এটাই সুফিদের তরীকা এমন কি প্রমাণ স্থাপনের বেলায়ও। এ অর্থে তাদের প্রসিদ্ধ একটি কবিতার লাইন আছে।

শেষে আমার অন্তর কেঁপে না ওঠে, আমার অনুভূতিসমূহ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে না যায়, তাই আগে ভাগেই ডঃ জামিলের সাথে সাক্ষাত করা বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু তিনি আমাকে ছাড়লেন না। একদিন হঠাৎ দেখি তিনি আমার দরজার কড়া নাড়ছেন। প্রথমে আমি আমার চোখকে বিশ্বাসই করতে পারিনি। দেখলাম আসলে তিনিই আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছেন। পূর্বের অভ্যাস মত দু'জনে অনেকক্ষণ যাবত বহু কথাবার্তা বললাম। এক পর্যায়ে যখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কেন আমি জুম'আর নামাযে উপস্থি হচ্ছিনা, জবাবে আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে বলে দিলামঃ

আপনার কাছ থেকে আমি খুব নিরাশ হয়েছি।

ডঃ জামিল বললেনঃ আমি কিন্তু আপনার কাছ থেকে নিরাশ হইনি। আক্বীদার জন্য আপনার ভেতরটা খুবই উর্বর।

বুঝলাম, নিশ্চয়ই তিনি তাঁর বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমাকে আয়ত্বে আনার চেষ্টা করছেন। এমন সময় তাঁর কাছ কাছে তাঁরই লেখা একখানা পুস্তিকা লক্ষ্য করলাম, যা ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের জীবনী নিয়ে লেখা।

তাঁকে বললাম, এ কপিটি কি আমাকে দেয়া যাবে?

তিনি বললেনঃ এ কপিটা এখন আপনাকে দেয়া হচ্ছে না। তবে আপনাকে একটি কপি দিব বলে ওয়াদা করছি।

প্রতিনিয়ত আমাকে উত্তেজিত করার জন্য এটাই তাঁর বিশেষ পদ্ধতি। আমি তাঁর কাছে যা-ই চাই, প্রথম চাওয়ায় তিনি আমাকে তা কখনও দেন না। তাই ঐ কপিটি আমি ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম এবং বইটি তাঁকে ফেরত দেব বলে অঙ্গীকার করলাম।

মধ্যরাতের পর বইটি পড়তে শুরু করলাম, বইটির বিষয় ও ভঙ্গি আমাকে আকর্ষণ করেছিল। ফলে ফজর পর্যন্ত আর ঘুমালাম না। পুস্তিকাটির কলেবর ছোট হলেও সেটা ছিল ঘূর্ণির মত, ভূমিকম্পের মত। এই বইটি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব যখন দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর তখনকার কাহিনী এবং দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে যেসব দীর্ঘ কষ্ট ও ক্লেশ সহ্য করেছেন,

আমার অন্তরকে তা নতুন দিগন্তে নিয়ে গিয়েছিল। যখনই আমি এক পৃষ্ঠা পড়তাম, তখন এর প্রতিটি ছত্রে আমার অন্তরকে উপস্থিত পেতাম। যখন কোন কারণে চিন্তা করতে অথবা অন্য বইয়ে কিছু খোঁজ করার উদ্দেশ্যে ঐ বইটি পড়া বন্ধ রাখতাম, তখনই অন্যায়বোধে আক্রান্ত হতাম। কারণ 'শায়খ' কে 'বসরায়' ফেলে এসেছি, ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষাটুকু করিনি। অথবা বাগদাদে রেখে এসেছি, তিনি কুর্দিস্তানের সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার যেন উচিত ছিল তাঁর সাথে ধৈর্য ধারণ করা, যে পর্যন্ত না তিনি ভ্রমণ হতে তাঁর দেশে ফিরে আসেন।

ডঃ জামিল তাঁর পুস্তকের এক জায়গায় লিখেছেন, শায়খুল ইসলাম ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)।

এ দীর্ঘ ঘুরাঘুরিও পরিভ্রমণের পর তিনি কী তাঁর হারানো বস্তুটি ফিরে পেয়েছেন?

না, কেননা ইসলামী জগত তখনও বহুবিধ ঘোর অজ্ঞতা, অবনতি ও পশ্চাদমুখীতায় ভুগছিল। শায়খ মুসলিম জাতির দুর্দশা এবং তাদের জীবনের সর্বস্তরে অধঃপতন ও পশ্চাদমুখীতার অভিশাপ লক্ষ্য করে এক বুক ভরা বেদনা নিয়ে দেশে ফিরলেন।

তিনি স্বদেশে ফিরলেন, তাঁর মাথায় একটি চিন্তা দিবা-রাত্রি তাঁকে তাড়না দিচ্ছিল;

- কেন তিনি মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করছেন না।

- কেন তিনি তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আদর্শ স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন না?

- কেন ... কেন ...?

অতএব, ডঃ জামিল যে আক্বীদা-এর কথা বলছেন তা কিন্তু শূন্য হতে আসেনি; বরং সেই দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর সূচনা লগ্ন হতেই ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব চিন্তা করছেন এবং প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যেন মাযারসমূহ ভেঙ্গে ফেলতে পারেন, কুসংস্কারের আখড়া ভেঙ্গে দেবেন এবং ঐসব বেদ'আতীদেরকে বিতাড়িত করবেন, যারা এ শ্বাশত শরীয়তের আসল চেহারাকে তাদের কল্পিত কর্ম-কান্ড দ্বারা অপবিত্র করেছে, যা যুগ পরিক্রমায় ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করে বসেছে।

তিনি পুস্তিকাটিতে এ সম্পর্কে আলোচনা করছেনঃ "জাতির হৃদয়ে এসব কাজের কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল?"

ঐতিহাসিকগণ এসব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। প্রফেসর আহমদ হোসাইন তাঁর "মুশাহাদাতী ফি জাযীরাতিল আরব" (আমার দেখা আরব উপদ্বীপের দৃশ্যাবলী) নামক গ্রন্থে লিখেছেন, সমাজের লোক শায়খের গাছ কাটা, মাযারের গম্বুজ ভাঙ্গা ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করেনি; বরং তাঁকে এ সমস্ত কাজ একাকী করতে দিয়েছে। কারণ, যদি কোন বিপদ আসে তবে তা যেন শুধু একা তাকেই মুকাবিলা করতে হয়।

এখন যে আমার সারা দেহ প্রকম্পিত হচ্ছে, সে কি ঐ ভয়ে, যা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম? এতো সেই ভয়, যা শায়খের মাতৃভূমি আল উয়াইনাহ এর বাসিন্দাদেরকে বাধ্য করেছিল শায়খকে গাছ কাটায় এবং যাইদ বিন খাত্তাব-এর মাযার ধ্বংস করায় সাহায্য না করতে, যেন এসব স্থান ও উহার কল্পিত বুজুর্গ ব্যক্তিদের কেরামত প্রসূত অভিশাপসমূহ তাদের না লাগে।

আমি পুস্তিকাটি পড়ছি। এর প্রতিটি পৃষ্ঠা পড়ার সাথে সাথে আমি অনুভব করছিলাম, আমি যেন আমার ভিতরের এক একটি ভ্রান্তির দেয়াল অতিক্রম করছি এবং বড় বড় পাথর ডিঙ্গিয়ে যাচ্ছি। এভাবে আমি যখন বইটির প্রায় আধা-আধি পড়ে ফেলেছি, তখন হঠাৎ আমার ভিতরে যেন বিরাট এক শূন্য গহ্বরের মতো অনুভব করলাম। সাথে সাথে আমার অন্তরে যেন পূর্ণ একীন ও বিশ্বাসের উজ্জ্বল নূর প্রবেশ করলো; কিন্তু যে অন্ধকারের ভীড় এতো কাল আমার হৃদয়ে বাসা বেঁধেছিল, তার কারণে আমার নতুন বিশ্বাসের আলোকচ্ছটা ক্ষণে জ্বলে তো, নিভে থাকে অনেকক্ষণ।

ডঃ জামিল ঠিকই বিজয়ী হলেন। তিনি আমাকে আমার অন্তরের বিরুদ্ধে যুদেধ লাগিয়ে ছেড়েছেন। আসলে তিনি আমাকে তাওহীদের কাফেলা এবং এর কর্ণধার মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের অনুসারী করে ছেড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁকে ঘিরে যেসব দূরভিসন্ধির বর্ণনা দেয়া হচ্ছে, এতে আমি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছি। দেখুন, তিনি যখন আল-উয়াইনা হতে সেই ব্যভিচারিণী মহিলার উপর হদ (ব্যভিচারিণীর জন্য শরীয়তের নির্ধারিত শাস্তি) প্রয়োগ করেছিলেন তখন আল-ইহসা[1] এর শাসনকর্তা (সুলাইমান বিন মুহাম্মাদ বিন

1। আল-ইহ্সা বর্তমান সৌদি আরবের একটি প্রদেশ।

আব্দুল আযীয আর হুমাইদী) কেমন রাগান্বিত হন এবং নতুন দাওয়াত ও দাওয়াত দানকারীর কারণে মহাবিপদ অনুভব করেন। সাথে সাথে আল-উয়াইনাহ এর তৎকালীন শাসনকর্তা ইবনে মুআম্মারকে পত্র লিখে আদেশ দেন, দাওয়াতের কার্যক্রম যেন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দাওয়াত দানকারীকে যেন হত্যা করার হয় আর অতিসত্বর তিনি (ইবনে মুআম্মার) নিজে যেন কুসংস্কার ও বিদ'আতের প্রতিষ্ঠিত আখড়ায় ফিরে আসেন।

যেহেতু ইবনে মুআম্মার শায়খের সাথে শ্বশুর-জামাই সম্পর্কে জড়িত হয়েছিলেন। তিনি নিজের কন্যাকে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করছিলেন; কিন্তু তিনি তাঁকে (শায়খ) একরুদ্ধ দ্বারা কৈঠকে ডেকে নেন এবং আল-ইহসা-এর শাসনকর্তার পাঠানো চিঠি পড়ে শুনান। অতপর চোখে-মুখে নিরাশার চিত্র এঁকে খোলাখুলি বলেন যে, তিনি আল-ইহসার শাসনকর্তার আদেশ অমান্য করতে পারবেন না। কারণ তিনি তাঁর সামনে শক্তিতে দুর্বল। নিরাশার ঘনঘোর ক্রান্তিকালে শায়খের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে ইবনে মুআম্মার-এর ঈমান ঠিক নেই। আর এ কঠিন পরিস্থিতি শায়খের আক্বীদার উপর অবিচলতা ও একত্ববাদের শক্তিকেই আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। খোদাদ্রোহী সীমালংঘনকারী শাসকগণ যুগে যুগে সত্যের প্রতি আহ্বানকারীদের বিরোধিতা ও যুদ্ধ করেছেন। এতে শায়খ হাসি মুখেই আল-উনায়নাহ ছেড়ে আল্লাহর একত্ববাদ নিয়ে আল্লাহরই পথে হিজরত করতে সম্মত হলেন এবং নতুন এমন এক এলাকার খোঁজে বের হলেন, যেখানে তিনি তাওহীদের বীজ বপন করতে পারেন।

ভোরে বাড়ির ভেতরে একটা অস্বাভাবিক শোরগোলে জেগে উঠি। বিছানায় মতিস্থির করতেই একটি আওয়াজ এসে কানে বেজে ওঠে। এটা ঠিক মানুষের আওয়াজও না, আবার ঠিক পশুর আওয়াজও না। ওটা ছিল ছাগলের ডাক, চীৎকার এবং মানুষের দুর্বোধ্য কথা ইত্যাদি। মনে মনে ভাবলাম, আমি এখনও বোধ হয় সেই কঠিন স্বপ্নের ঘোরে আছি। ধীরে ধীরে আমি নিশ্চিত হলাম যে আমি জাগ্রতই আছি। ছাগলের ডাক এত কর্কশ ছিল যে আমার কানের পর্দা বিদীর্ণ করে ফেলেআর কি!

এদিকে আমার স্ত্রী এক খুশির খবর নিয়ে আমার নিকট এলেন। সংক্ষেপে তা হলো- "আমার যে খালাতো বোন 'সাঈদ' অঞ্চলের সর্বশেষ প্রান্তে বসবাস করেন সে তার স্বামী এবং তার তিন বছরের ছেলেকে নিয়ে এই ভোরে সবেমাত্র সে পৌঁছেছে, তারা তাদের সাথে একটা খাসীও নিয়ে এসেছে।"

ভাবলাম স্ত্রী বুঝি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন। আমি জানতাম যে প্রথম বছর গুলোতে আমার খালাতো বোনের সন্তানগুলো মারা যেত- হয়তো নিজের শিশুর নাম দিয়েছে 'খারুফ" (খাসী) যেন বেঁচে থাকে। এরূপ নাম রাখা 'সাঈদ' অঞ্চলে প্রচলিত প্রথা ছিল। বিষয়টি আগাগোড়া বুঝে ওঠার আগেই ছেলেমেয়েদের দলবদ্ধ দৌড়াদৌড়ি অনুভব করলাম এবং সে দৌড়াদৌড়ির আওয়াজ ক্রমশঃ আমার শোবার ঘরের কাছাকাছি এসে পড়ছিল। এরই মাঝে হঠাৎ এবং একেবারে বিনা অনুমতিতে খাসিটি আমার ঘরের দরজা দিয়ে সরাসরি ভেতরেই ঢুকে পড়ল। তার ঘন লম্বা পশমযুক্ত চামড়া, শিং এবং পা, ওটা ছেলেমেদের তাড়া খেয়ে পাগলের মতো ছুটছে। ওর সামনে যা বাধা পড়ছে সবই ভেঙ্গে চুরমার করছে। অতপর খাসিটি আয়নার দিকে ছুটল, আর যায় কোথায়! প্রচন্ড এক লাফ দিল আয়নার দিকে আর সাথে শিং দিয়ে আয়নায় আঘাত করে পড়ে গেল এবং আশ্চর্য ধরণের কিছু আওয়াজ করতে লাগলো, আর সাথে সাথে আয়নাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল।

এসবই সামান্য এক মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল। আমি শ্বাস না নিতেই আমার মনে হলো আমাদের বাড়িটি যেন একটি চিড়িয়াখানার পাশেই, যদিও আমি 'আল-আব্বাসিয়ায়' বসবাস করতাম, আর চিড়িয়াখানা হলো 'আল-জিযায়'। আমি নিজে খাটের ওপর হতে লাফিয়ে পড়েছি। ওদিকে আমার স্ত্রী ঐ ভয়ঙ্কর ছাগলের ভয়ে গুটি-সুটি হয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে।

যে ছাগলটি আমাদের নিরিবিল পরিবেশে অতর্কিতে ঢুকে পড়েছিল, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য আমার স্ত্রী তাঁর দুচোখের ইশারায় আমাকে উৎসাতি করছিলেন; কিন্তু শোরগোল ও ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়া কাঁচ পশুটির পাগলামী আরও বহু গুণে বাড়িয়ে দিচ্ছিল। এ সময় আমি পশুটির দুচোখে ও দু শিংয়ে চেপে বসা ভয়ানক মৃত্যুকে লক্ষ্য করছিলাম। আমি পালঙ্কটাকে মজবূতভাবে আঁকড়ে ধরে লড়াইকারীদের সকল কলা-কৌশল পরীক্ষার ঠিক আগ মুহূর্তে আমার খালাতো বোন এসে আমার ঘরে যখন ঢুকলো, তখন সে ছিল পূর্ণ বিরক্তির মধ্যে, এ সময় তাঁর ধারণা হচ্ছিল- আমি বুঝি ছাগলটিকে মেরে ফেলব।

সে বিকট চিৎকার করে বলে ওঠলঃ মনে রাখিস, এটা সাইয়্যেদ বাদাভীর খাসি।

এরপর সে ছাগলটাকে ডাকলো, ছাগলটা তার পাশে চলে গেল। সে যেন একটি আদরের শিশু। এরপর সে ছাগলের মাথায় হাত দ্বারা আদর ভরে আস্তে আস্তে থাপড়াতে থাপড়াতে আমার কাছে বর্ণনা করতে লাগলো যে, সে সাঈদ থেকে এ সুন্দর ছাগলের বাচ্চাটা নিয়ে এসেছে এবং তিন বছর লালন-পালন করেছে- তার ছেলের বয়সও তিন বছর। কারণ সে সাইয়্যেদ বাদাভীর নামে মানত করেছিল যে, তাঁর ছেলে যদি বাঁচে, তবে বাদাভীর দরগায় একটি ছাগল যবেহ করবে। আগামী পরশু তৃতীয় বছর শুরু হতে যাচ্ছে মানত করার দিন।

যখন সে এসব কথা বলছিল তখন সে ছিল খুবই হাসি-খুশী এবং উৎফুল্ল। আমি আঙ্গিনায় বের হলাম তার স্বামীকে দেখার জন্য। সেও ছিল দারুন স্ফূর্তিতে। সে আমাকে তাদের সাথে 'ত্বানত্বা' যেতে অনুরোধ জানালো, যেন আমি ওদের সাথে থেকে ঐদিন ওখানে মানত আদায়ের বিরাট অনুষ্ঠান স্বচক্ষে দেখতে পারি। ওরা অনেক দূরের লোক বলে মাত্র একটি ছাগল এনেছে। আর যারা 'সাইয়্যেদ বাদাভীর' আশ-পাশের লোক তারাতো দলে দলে উঠ পাঠিয়ে দেয়। এখন কর্তব্য হয়ে পড়ল আমার খালাত বোনকে খুশী করা, অন্যথায় আমি আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী বলে গণ্য হয়ে পড়ব। আমার ভাগিনা বাঁচুক বা মরুক তাতে আমার কোন চিন্তা নেই। অথচ এই শিরিকী অনুষ্ঠানে শরীক না হয়েও উপায় নেই। আবার একই সময় নিজকে প্রশ্ন করছিলাম, আমার বোন তো কুফুরীর কাজে চলছে, এ কথাটা তাকে বুঝাই কিভাবে? আর তিন বছর যাবত লালিত সোনালী স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে চুরমার করে দেব, তখন-ই বা কি ঘটবে?

মনে মনে ভাবলাম, প্রথমে ওর স্বামীকে বিষয়টা বুঝাব, কারণ পুরুষরাই হলো মহিলাদের উপর কর্তৃত্বশীল। ওর স্বামীকে ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলাম এবং ইচ্ছে করেই বইটা এমনভাবে ধরলাম, যেন সে দেখতে পায় যে, আমার হাতে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের একটি বই আছে। সে হাত বাড়িয়ে বইয়ের মলাট নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে শিরোনামটি পড়ামাত্রই লাফিয়ে উঠল। মনে হলো যেন জ্বলন্ত অঙ্গার ধরেছিল।

আমার খালাতো বোনের স্বামী ঐ বইয়ের শিরোনামটি পড়লো, তাতে লেখা ছিল- এই বইয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব ও তাঁর সংস্কার আন্দোলনের কাহিনী আছে। এটুকু পড়েই সে চিৎকার করে উঠলঃ এ আমি কি পড়ছি। এই বই আমার হাতে কিভাবে এলো? নিশ্চয়ই তারা কেউ তার কাছে আমার নামে চোগলখুরী করেছে!! এই বই দেখিয়ে তুমি আমার নামে চোগলখুরী

করছো। অথচ সে তো জানে যে, আমি একজন মধ্যপন্থী, ধর্মের প্রতি যত্নবান, মাযার যিয়ারত করি, মাযারে মোমবাতি দান করি। কখনও যবেহ করা পশু আবার কখনও বা জীবিত পশু মাযারে মানত করে থাকি। ঠিক যেমনটি সে নিজেও করে থাকে। আমি তার দু'চোখের দুঃখের চাহনী প্রত্যক্ষ করলাম যে, (সে ধারণা করছে) যে দুর্ভাগ্য আমার নিকট ঐ পুস্তিকাটিকে কিভাবে পৌঁছিয়ে দিল।

এ অবস্থায় তাঁর ব্যাপারে আমার এমন ভূমিকা রাখা কর্তব্য হয়ে পড়ল, যে ভূমিকা ইতিপূর্বে ডঃ জামিল আমান জন্য করেছিলেন। আমি যা পড়াশুনা করেছি তা কি প্রয়োগ করতে সক্ষম না অক্ষম? আমি যা অধ্যায়ন করেছি তা কি বিশ্বাসের সাথে হৃদয়ঙ্গম করেছি না করতে পারিনি? এর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হলোঃ আমি আক্বিদার উপর কতটুকু স্থির আছি? এবং এর দ্বারা অন্যদেরকেও আমি কতটুকু বুঝাতে সক্ষম হয়েছি? যে ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিমন্ডলে বাস করে, অথচ তাদেরকে নিজ আক্বিদা দ্বারা প্রভাবিত করতে সক্ষম হচ্ছে না তাহলে বুঝতে হবে সে ইতিবাচক আক্বিদার অধিকারী নয়। সুতরাং আমি আমার তাওহীদকে আমার নিজের মাঝে চেপে রাখব আর অন্যদেরকে পথভ্রষ্টতার মাঝে জীবন-যাপন করতে ছেড়ে দিব, এটা কোনক্রমেই জ্ঞান সম্মত নয়। কারণ এরাই তো কিছু দিন পর স্বয়ং আমাকে তাদের কুসংস্কারের মাঝে ডুবিয়ে ফেলবে। আর এজন্যই তাদের সাথে আমি উত্তম ভাষণে অবশ্যই যুক্তি তর্ক করব। আমি তাদেরকে সহজে ছেড়ে দেবনা, যেন তারা বিষয়টিকে হালকা মনে করতে না পারে। আমি তাদেরকে শিরক থেকে অবশ্যই বিরত রাখব। অবশ্যই তাদের শিরক ছেড়ে ফিরে আসতে হবে। কেননা কুসংস্কার সে তো ভিত্তিহীন গোমরাহীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে খানিকটা সন্দেহ প্রবেশ করা মাত্রই তাকে চুরমার করে দেবে, আর এরই সাথে ওখানে একটু সত্য গিয়ে পৌঁছলে উহাকে (কুসংস্কারকে) চিরতরে বিনষ্ট করে ফেলবে। অথবা অন্ততঃ পক্ষে কুসংস্কারের প্রসারতাকে থামিয়ে দিতে পারবে, যেন উহা অন্যদের ক্ষতিসাধন করতে না পারে। আর এসব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম যে, আল্লাহর উপর ভরসা করে লোকটিকে বুঝাতে শুরু করবো। কাজটা কিন্তু সহজ ছিল না। এজন্য সর্বপ্রথম তাকে আমার সান্ত্বনা দেয়া দরকার এবং তারও শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাবের জীবন চরিত্রের মাঝে যা কিছু পার্থক্য আছে তা দূর করা প্রয়োজন। এরই সাথে তার অন্তরে যে

ওয়াহ্হাবী মতবাদ এবং ওয়াহ্হাবীদের সম্পর্কে কুধারণা বহুদিন যাবত বদ্ধমূল হয়ে আছে তা দূর করা দরকার।

কথাবার্তার শুরুতেই সে ওয়াহ্হাবী মতবাদ সম্পর্কে অনেক রকম অপবাদ দিল। অথচ আল্লাহ তো জানেন যে তাওহীদ-এর দাওয়অত ওসব মিথ্যা অপবাদ, অভিযোগ থেকে তেমনই মুক্ত ছিল যেমন ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর রক্তপান করার অপবাদ হতে মুক্ত ছিল বনের বাঘ।

তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি অনেকে যে অসন্তুষ্টি ও ঘৃণাপূর্ণ আক্রমণ করে থাকে, তার অন্তর্নিহিত রহস্যটা অত্যন্ত আগ্রহ ও মনোবল নিয়ে তাকে বুঝাতে গেলাম। কিভাবে শরীয়তের আচার অনুষ্ঠান, ইবাদতের বিধি-বিধানসমূহ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে? তন্মধ্যে রয়েছে ধোঁকাবাজদেরকে শেষ করা, মাযারসমূহের খাদেমগণ এবং মোড়লগণ এবং যারা বছরের পর বছর ধরে জান্নাতের আসন সীমিত ও সময় সংকীর্ণ (এই ভয় দেখিয়ে) বরকত বিক্রি করে বেহেশতের আসন লাভে আগ্রহীদের নিকট পূণ্য বন্টন করে প্রাপ্ত ধন-সম্পদের পাহাড় রচনা করেছে, তাদের খতম করা। "ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিউল আযীম" (মহামহিম আল্লাহ ব্যতীত আর কারোও অধিকার নেই, কোন শক্তি নেই।)

আমি তাঁর চোখে-মুখে সৌভাগ্যের ছাপ লক্ষ্য করছিলাম, সে আতঙ্ক ভরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, যেন সে জ্ঞানহীনতা থেকে জ্ঞান ফিরে পাচ্ছে। এতদসত্বেও সে ভয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছিল এবং যে সকল ব্যক্তি কবরে শুয়ে ও তাদের আত্মার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সারা জগত নিয়ন্ত্রণ করছেন তাদের পক্ষ অবলম্বন করে তর্ক করছিল। তার বক্তব্য ছিল যে, তাদেরকে (বুযুর্গগণকে) প্রতি শুক্রবার রাতে কুতুবগণের মধ্য হতে কোন একজন কুতুবের কাছে সম্মেলনে উপস্থিত হবার উদ্দেশ্যে ডাকা হয়ে থাকে। এমনকি প্রসিদ্ধ মহিলাগণও ঐ সকল পুরুষ কুতুবদের সাথে সম্মিলিত হয় এবং সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করে। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে সে যে সব আকীদা পোষণ করে এসেছে, তাকে তা হতে দূরে সরাতে চাইলাম। আমি তাকে শুধু এতটুকু বলেই ক্ষান্ত হলাম যে, সে যেন বিষয়টি ভেবে দেখে। মাযারসমূহে শায়িত ঐ সকল মৃত ব্যক্তিগণ আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত নাকি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বেশি সম্মানিত? কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব অথবা স্বজনপ্রীতি ছাড়া বিষয়টি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার কাছে যেন আসে।

সে ভেবে দেখবে বলে আমাকে ওয়াদা দিল; কিন্তু সে আমাকে শুধু এতটুকু অনুরোধ করল যে, আমি যেন তাদের সাথে 'ত্বনত্বা' অভিমুখে এহেন পুণ্য যাত্রায় শরীক হই। আমি তাকে বললাম, এটা কখনও সম্ভব নয়। আর সে এবং তার স্ত্রী একান্তই যদি 'সাইয়্যেদ বাদাভী"-এর দরবারে যেতে বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে যেন তাদের ছেলে বেঁচে থাকে- তবে এর একমাত্র অর্থ হলো জীবন-মরণ সাইয়্যেদ বাদাভীর হাতে। তখন সে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বললোঃ খবরদার মিয়া কাফের বলবেন না।

তখন আমি বললামঃ আমাদের মধ্যে কে কাকে কাফের বলেছে? আমি নাকি তুমি? আমি তোমাকে অনুরোধ করছি যে, আল্লাহর দিকে মুখ ফিরাও। অথচ তুমি সাইয়্যেদ বাদাভীর দিকে মুখ ফিরাতে বদ্ধপরিকর!

এতে সে চুপ হয়ে গেল এবং এরূপ ব্যবহারকে আমার পক্ষ হতে তার আতিথেয়তাকে অপমান করা হলো বলে মনে করে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে ঝট-পট চলে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার স্ত্রীও ঐ খাসি ও তার ছেলেটাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা কায়রোর আব্বাসিয়া হতে সোজা ত্বানত্বা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল। আমি তাদেরকে বিদায় দেয়ার সময় ভদ্রলোককে কানে কানে বলে দিলাম, সে যদি ঐ শিরিকী পাপের অনুষ্ঠান শেষে ফেরার পথে আমাদের এখানে না আসে তবেই আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং তাকে অনেক ধন্যবাদ জানাবো; অন্যথায় সে আমার এমন ব্যবহার দেখবে যাতে সে খুবই কষ্ট পাবে। একথা শুনে তো তার "আক্কেল গুড়ুম"। এরপরই মেহমানগণ ছাগল নিয়ে ত্বনত্বা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেল।

এদিকে আমি তাদের সাথে এহেন কঠিন আচরণ করার কারণে আমার স্ত্রী আমাকে ভৎর্সনা করতে লাগলেন। তারা তাদের সন্তানের ব্যাপারে ভয় করছিল। তাদের বহু সন্তান মরে যাবার এবং বয়স উত্তীর্ণ হবার পর যে বাচ্চাটি বেঁচে আছে তার ব্যাপারে তারা ভয় করছিল। আমার স্ত্রীর সামনে আমি উচ্চস্বরে বললামঃ শিশু যদি বেঁচে থাকে তবে আল্লাহ তার বেঁচে থাকা চেয়েছেন বলেই বেঁচেছে, আর যদি সে মরেই যায়, তবে আল্লাহই তার জন্য উহা চেয়েছেন বলেই সে মরেছে। আল্লাহর কাজ-কর্মে কোন শরীক নেই। তার ইচ্ছার মধ্যেও কেউ শরীক নেই।

আমি যে পত্রিকায় কাজ করতাম, সে অফিসে গিয়েই দেখি ডঃ জামিল তার নিজের কোন প্রয়োজনে আমার সাথে কথা বলার জন্য টেলিফোন করেছেন। অথচ

তাঁর বইটি আমার সাথে কি আচরণ করেছে? বা আমি বইটি পেয়ে কি করেছি সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞাসা করার বিষয়টি তাঁর মনে উদয় হয়নি। অগত্যা আমিই তাঁকে বলতে বাধ্য হলাম যে ঐ বইটিতে এমন কিছু বিষয় আছে যার কয়েকটি নিয়ে তাঁর সাথে আমার আলোচনা করা প্রয়োজন। এরপর রাতে আমরা তার সাথে সাক্ষাত করলাম এবং সাঈদ থেকে যে বিপদ এসে আমার ঘাড়ে চেপেছিল আদ্যোপান্ত তাকে বললাম। আমি তাদেরকে শিরক থেকে দূরে অবস্থান করার জন্য বুঝাবার চেষ্টা করেছি, অথচ মাত্র কয়েকদিন পূর্ব পর্যন্তও আমি তাদের চেয়ে কম শিরক করতাম না। এসব জেনেও তিনি আমার চেষ্টার ওপর ভাল মন্দ কিছুই বললেন না। উপরন্তু আমিই তাঁকে বললামঃ আপনি যা যা আমাকে বলতেন, আজ আমি তাকে তাই বললাম, এটা কি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেনা?

তিনি শান্তভাবে আমাকে বললেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি দাওয়াতের জন্য একটি 'সফল পদার্থ' হয়ে ওঠব। আমি এটা প্রমাণ করতে ইচ্ছা করেছিলাম যে আমি 'পদার্থ', আমি আদম সন্তান নই কিন্তু ডঃ জামিল থেকে রইলেন না। তিনি বললেন মাত্র অর্ধেক বই পাঠ করার পরই আপনার দ্বারা এতসব ঘটে গেল, আর যদি বাকি অন্য সকল বই পড়ে ফেলেন তবে না জানি আপনি কত কিছু করে ফেলেন। বলেই তিনি অট্টহাসিতে ডুবে গেলেন।

কয়েকদিন পর জানতে পারলাম যে, আমার সেই আত্মীয় 'ত্বনত্বা' থেকে সোজা সাঈদ চলে গেছে, যাবার পথে কায়রোতে আমাদের বাসায় দেখা করে যায়নি। কারণ সে আমার প্রতি খুবই রাগান্বিত ছিল। বাড়ির সকল বড়দের কাছে আমার ব্যাপারে অভিযোগ করেছে।

পরবর্তী সপ্তাহে একদিন আমার বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে আতকে উঠলাম। আমার ছোট ছেলেটি দেখতে গেল বিষয়কি? এসে আমাকে বললঃ ইব্রাহীম আল-হারান এসেছেন। 'আল-হারান' সে তো আমার খালাতো বোনের স্বামী। আবার কি হলো? তবে কি তারা নতুন আর একটি ছাগল নিয়ে এলো? নতুন কোন মাযারের জন্য নতুন কোন মানত নিয়ে এলো না তো? না অন্য কিছু?

সিদ্ধান্ত নিলাম এবার আর নিশ্চুপ থাকব না, প্রয়োজনে সীমালংঘন করবো, মার-পিট করতে হলেও করবো। এরূপ উত্তেজনা নিয়ে দরজার দিকে যেতেই দেখি 'আল-হারান' আমার করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আমি তাকে ভিতরে আসার আহ্বান জানালাম, সে বিনয়ের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করল।

তবে সে কেন এসেছে? কি উদ্দেশ্যে তার আগমন? সে একটু মুচকি হেসে শেখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের যে বইটি আমার নিকট ছিল তা চাইল। আমি তাকে একরকম জোর করে ভিতরে আনলাম এবং তার প্রতি দীর্ঘক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে পাশের একটি চেয়ারে বসলাম।

অজ্ঞতার এক দুর্গ যেন ধ্বসে পড়ল; কিন্তু কেন? কিভাবে ঐ দুর্গ ধ্বসে পড়ল? আমার এ ভাই ইব্রাহীম দু'পায়ে হেঁটে এসে অনুরোধের সুরে তাওহীদের রাস্তায় চলা শুরু করতে চাচ্ছে সে যে ফিরে এসেছে, তা নিশ্চয়ই এমন ব্যাপার, যা কোন মহা শক্তিশালী কারণ ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। যা তার অন্তরাত্মাকে খুলে দিয়েছে। ফলে সে এতদিন যেসব মৌলিক সত্য সম্বন্ধে গাফেল ছিল সে সব আজ বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

আমার মাথা চক্কর দিচ্ছিল। আমি যাতে অজ্ঞান হয়ে না পড়ি, তাই সে আমার প্রতি দয়া করে আগে কথা বলা শুরু করল। যে কথাটা তার মুখ থেকে প্রথম ছিটকে পড়ল, তা যেন ছিল কোন এক পর্বত চূড়া হতে নিপতিত পাথরের মত ভারী, যা আমার কানে এসে আঘাত করল। এরপর তা যেন মাটিতে আছড়ে পড়ে নিজে নিজে বিস্ফোরিত হতে লাগল। এর প্রতিটি কণা যেন আঘাত করছে এবং রক্তাক্ত করে ফেলছে।

সে বললঃ ত্বনত্বা হতে ফেরার পর পরই আমার ছেলেটি মারা গেছে। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা সকলেই আল্লাহর জন্য নিবেদিত, আর নিশ্চয়ই আমরা তারই কাছে প্রত্যাবর্তনকারী)। ইব্রাহীমের এটি ছিল চতুর্থ ছেলে, যারা একের পর এক মারা গেল। যখনই কোন ছেলে তৃতীয় বছরে পৌঁছতো তখনই সে তার আগের জনের সাথে গিয়ে মিলিত হতো। সে তার স্ত্রীসহ ডাক্তারের কাছে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চিকিৎসার জন্য না গিয়ে (যেখানে সন্তানের রোগের কারণ বাপের রক্ত অথবা মায়ের রক্তের মধ্যে হতে পারে) ছেলে যেন বেঁচে থাকে তজ্জন্য স্ত্রীসহ একবার এ পীরের দরবারে মানত, আবার অমুক মাযারে মানত, আরেকবার 'বানী সুয়াইফের' সেই পর্বত গুহায় মানত করাকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর কোন কিছুরই তার কোন উপকারে আসেনি। সে যে নিজের মূর্খতা দেখিয়েছে এবং অন্যায় করেছে তা সত্বেও আমি দুঃখিত হলাম এবং আন্তরিকভাবে ব্যথিত হলাম। তাকে হাতে ধরে ভেতরের ঘরে নিয়ে গেলাম এবং তার মুখে বিস্তারিত শুনতে বসলাম।

ত্বনত্বা থেকে তারা দেশে ফিরেছে। তারা যে খাসিটা 'সাইয়্যেদ বাদাভী'এর মাযারের দরজায় যবেহ করেছিল তার কিয়দংশ সাথে এনেছিল। হায়রে মূর্খতা! মাযারের গোশত তারা কিছুটা বাড়িতে নিয়ে আসে এজন্য যে, মাযারের বরকতময় তাবাররুক অবশিষ্ট আশেক্বীনদের মধ্যেও যেন বন্টন করতে পারে। কিছু অংশ এনেছিল নিজেদের খাবারের জন্য। কিন্তু সংরক্ষণের মত উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকায় নষ্ট হয়ে যায় এবং যারা তা খেয়েছে তাদেরই ডায়রিয়া হয়ে গিয়েছে। বয়স্ক যারা তারা চিকিৎসা করে টিকে ছিল; কিন্তু এ শিশুটি কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ল। মা মূর্খতাবশতঃ 'সাইয়্যেদ বাদাভীর' হস্তক্ষেপের অপেক্ষায় ছিল; কিন্তু না, শিশুর অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে খারাপ হতে লাগলো। মা শেষের দিকে বাচ্চাকে নিয়ে যে ডাক্তারের নিকট গেল সে ডাক্তার বললো যে, ছেলেটিকে বিনা চিকিৎসায় ফেলে রেখে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। এ খবর মাকে সংজ্ঞাহীন করে ফেলল। তার রোগ ছিল ৪ দিন। ডাক্তার মাথা নাড়লেন; তবুও তিনি নিরাশ হলেন না, তিনি ঔষধ লিখলেন, ইনজ্যাকশন দিলেন; কিন্তু শিশুর রোগ আরও বৃদ্ধি পেল, তার শরীর রোগ প্রতিরোধ করার মত শক্তি সঞ্চয় করতে পারলো না, ফলে সে মারা গেল।

শিশুটির মৃত্যুর মাধ্যমে সকল অসুবিধা শুরু হলো। আঘাতটা পড়েছিল মায়ের উপর বেশি, যা তার সহ্য সীমার বাইরে ছিল, যে কারণে সে স্বাভাবিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে সে সামনে যা পেত তাই কাঁধে তুলে নিয়ে নাচত এবং আদর-আহলাদ করতো, যেন ওটাই তার ছেলে। অপর দিকে পিতা আত্মসংবরণ করে সঠিক পন্থায় গভীর মনযোগের সাথে চিন্তা করছিল। ঐ আঘাতের পর বুঝতে পেরেছিল যে, এই পুরো বিষয়টি সেই একমাত্র লা শারীক আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাদের বছরের পর বছর বিভিন্ন কবর ও মাযারসমূহে যাওয়া-আসা করা, ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করেনি। সে আমার কাছে রীতিমত স্বীকারই করলো যে, তার ও আমার মাঝে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা তাদের বিপদ ঘটে যাবার পর তার কানে বেজে ওঠে। এ সময় আমি চুপ করলাম। পরে আমি তাকে এমন কিছু কথা বললাম, যা তার ব্যাথার বোঝাকে কিছুটা হালকা করবে এবং যা সাধারণতঃ এ সকল পরিস্থিতিতে বলা যেতে পারে। কিন্তু তার অন্তরে আরও কিছু কথা বাকী ছিল। বিপদাপন্ন ঐ মহিলার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল, তা তখনও সে বলে শেষ করেনি- সে তার পাগলামী থেকে হয়েছে কি না?

আমিই তাকে বললামঃ আশা করি আল্লাহ তায়ালা ছেলের মাকে তার পাগলামী থেকে নিরাময়তা দান করেছেন? সে মাথা নেড়ে জবাব দিলঃ ওর মা বাপ ওকে আর কিছু মাযার ও গির্জায় ভ্রমণে যেতে বদ্ধপরিকর। তাকে নিয়ে কোন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখানোর প্রস্তাবকে তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছে। শুধু এখানেই শেষ নয়। বরং তারা তাকে নিয়ে গিয়েছিল জিন বশকারিনী এক মহিলার কাছে। সে তার জন্য একটি সাদা থালায় কি যেন লিখে দিয়েছিল। এভাবে তার রোগ দিন দিন বেড়েই চলছে এবং কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছে। ঐ ধোঁকাবাজরা যা কিছু করছে, তা সব ওদের কে যে মোটা অংকের টাকা দেওয়া হচ্ছে, তার সাথে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

সর্বশেষ ইব্রাহীম যখন দৃঢ়ভাবে স্ত্রীর বিষয়টিকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্যত হয়েছে এবং জোর দিয়ে বলেছে যে, হয় তাকে ডাক্তার দেখাবে আর তা না হয় তাকে তালাক দিবে; যেহেতু শ্বশুর বাড়ির লোকেরাই ওকে নষ্ট করার কারণ। এ সময় তার শাশুড়ি সামনে এগিয়ে এসে তার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং জেদ ধরেছে। এই পরিস্থিতিতে সে অনিচ্ছা সত্বেও তাকে তালাক দিতে বাধ্য হয়। তার এ কাহিনী আমাকে ভীষণভাবে উদ্বেলিত করেছিল। আমি যে বইটি ডঃ জামিল এর নিকট থেকে পেয়েছি তা হাতছাড়া না করতে অতিশয় আগ্রহী হওয়া সত্বেও বইটি নিয়েই ইব্রাহীমের কাছে এসেছিলাম এবং তাকে তা দিয়েছিলাম। সে বইটি নিয়ে দু'হাতে উলট-পালট করে দেখে নিল। বইটির শেষের মলাটে যে লেখাটি ছিল তা উচ্চঃস্বরে পড়তে লাগলো যেন আমাকে শুনাবার আগে সে নিজেকে শুনাচ্ছে। লেখাটি ছিল "শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব"এর কথা "ইসলাম নষ্টকারী বিষয়সমূহ"।

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. ﴾

(سورة المائدة ٧٢)

"নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থির করবে, তার জন্য আল্লাহ তায়ালা বেহেশত হারাম করে দিবেন, তার বাসস্থান হবে দোযখ এবং এরূপ যালেমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা আল-মায়িদাহঃ আয়াত ৭২)

ঐ অংশীদার স্থাপনের মধ্যে রয়েছেঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে যবেহ করা। যেমনঃ কেউ কেউ জিন-ভূতের জন্য যবেহ করে, আবার কেউ কোন মাযারের উদ্দেশ্যে যবেহ করে থাকে ইত্যাদি।

সে মাথা উঠাল এবং আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। এরপর বইটি নিয়ে চলে যাবার সময় অঙ্গীকার করলো যে কয়েক দিন পর বইটি আমাকে ফেরত দেবে এবং আমি 'তাওহীদ' এর পথে চলার জন্য তাকে সাহায্য করব।

ইব্রাহীম চলে গেল কিন্তু তার ওপর যে দুঃখ ও বেদনা আপতিত হয়েছিল তা ধীরে ধীরে আমার সমস্ত সত্তায় কানায় কানায় ছেয়ে যাচ্ছিল। এটা কোন ব্যক্তিগত দুঃখ ছিল না, কোন দলেরও নয়। এটা ছিল বহু দেশের কিছু মুসলমানের দুঃখজন ঘটনা। সত্যের চেয়ে কুসংস্কারই তাদের কাছে বেশি প্রিয়। হেদায়াতের চেয়ে পথ ভ্রষ্টতাই তাদের আত্মার অধিক নিকটতর ছিল। বিদ'আত (সওয়াবের কাজ মনে করে ধর্মে কোন নতুন কিছু সংযোজন করা) তাদেরকে সুন্নাত হতে দূরে বহু দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ডঃ জামিলের সাথে ফোনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করলাম। আমি তাঁকে ইব্রাহীম এর খবরটা দিতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তাঁকে পেলাম না। এরপর তার হতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকায় কাজ শুরু করি, যা আমার "আরবী সাহিত্যে অপরাধ" শীর্ষক কিছু গবেষণা কর্ম নিয়মিত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছিল।

একদিন আমি আমার সামনে বই-পত্র খুলে সারি সারি রেখে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে লেখা শুরু করেছি, এমন সময় টেলিফোন বেজে ওঠল। যিনি কথা বলছিলেন, তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উপরস্থ সরকারী অফিসার। অপরাধ বিষয়ক সাংবাদিকতা পেশায় একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে রাজপ্রাসাদে সরকারী একজন কর্মচারীর নিহত হবার ঘটনা তদন্তের জন্য তিনি আমাকে ডেকেছেন। মৃতের লাশ দুই দিন আগে ফেরীওয়ালার গাড়িতে পাওয়া গেছে।

সকল কাজ ফেলে তদন্তের ময়দানে চলে গেলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল যে, যে কারণে এ অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে, তাও ছিল শিরক, ধোঁকাবাজি ও কুসংস্কারের এমন ঘটনা, যা শুনলে করুণা হয়। নিহত ব্যক্তি ঐ প্রাসাদে চাকুরীর পাশাপাশি জিন সংশ্রবের কথা বলতো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল থাকলে সে তাদের

মধ্যে মিল করে দিতো, কিছু কিছু রোগের চিকিৎসা করতো এবং মানুষের কঠিন সমস্যাদি সমাধান করতে ক্ষমতা রাখে বলে দাবী করতো।

হত্যাকারী ছিল 'সাঈদ' অঞ্চলের লোক। বয়স পঞ্চাশের কিছু উপরে। সে এক মহিলাকে বিবাহ করেছিল। তার সন্তান হয়নি। ফলে তাকে তালাক দিয়ে সতের বছরের এক মহিলাকে বিবাহ করেছে; কিন্তু সেও কোন সন্তান প্রসব করেনি। সে অনেক বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-ভাবনা করে বুঝতে পেরেছে যে, তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী তার প্রতি প্রতিশোধমূলক যাদু করেছে, যা তাকে নতুন স্ত্রীর মাধ্যমে সন্তান লাভ করতে বাধা দিচ্ছে।

সে এমন এক যুবকের সাথে যোগাযোগ করল, যার বয়স চল্লিশের নিচে। তার সাথে কথা হল, সে যেন এ যাদু নষ্ট করার ব্যবস্থা করে। এ ধোঁকাবাজও এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েই গ্রহণ করল, তার সাথে তার বাড়িতে চলে গেল। রাতে ধোঁকাবাজ খাবার গ্রহণের পর, জিন হাজির করার জন্য আগরবাতি, ধুপ, মোমবাতি ও আতর ইত্যাদির তালিকা লিখে বাড়িওয়ালাকে ওসব সংগ্রহ করতে বলল। বাড়িওয়ালা ঐ ধোঁকাবাজ ও নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে ঘরে রেখে ওসব কিনতে বাজারে চলে গেল।

এহেন পরিবেশে যা ঘটে, তা না ঘটে উপায় ছিল না। কাল বিলম্ব না করে কবিরাজ অসুস্থ মহিলার উপর চড়াও হতে চেষ্টা করে। সে মহিলার সতিত্ব নষ্ট করার উদ্দেশ্যে ফুসলাতে থাকে, অথচ সে ছিল একজন ভদ্র ও বিদুষী মহিলা। সে স্বামী না আসা পর্যন্ত পড়শী মহিলার কাছে অবস্থান করার জন্য ঘর থেকে বের হতেই দেখে যে, তার স্বামী এসে পৌঁছেছে। সে টাকা নিতে ভুলে গিয়েছিল। তখন স্ত্রী গোস্সার সাথে ধোঁকাবাজ কবিরাজের পুরো ঘটনা বর্ণনা করতেই সাঈদবাসী স্বামীও অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে মোটা একটা লাঠি নিয়ে কবিরাজের উপর ঝাপিয়ে পড়ে এবং তার মাথা গুড়ো করে ফেলে।

সে প্রকৃতিস্থ ছিল না, যখন সম্বিত ফিরে পেলো তখন দেখে একটা লাশের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তাকে এ লাশের দায়-দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পাওয়ার চিন্তায় পেয়ে বসলো। সে রাতেই বাজার থেকে ফেরীওয়ালাদের একটা ঠেলাগাড়ি কিনে নিয়ে এল। লাশটি ঐ ঠেলাগাড়ির উপর রেখে অপেক্ষা করতে। রাত যখন মাঝামাঝি হয়ে এল, তখন লাশ নিয়ে তাদের পার্শ্ববর্তী এক খোলা

জায়গায় ফেলে দিয়ে এল। বাসায় এসে হত্যার সকল চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। সে ভাবল হত্যার অপরাধ হতে চিরতরে সে নিস্কৃতি পেয়েছে।

কিন্তু না, পুলিশের লোকেরা লাশ পাবার পর যে ঠেলা গাড়ির মধ্যে লাশ রাখা ছিল ওটির উপর তাদের অনুসন্ধান চালাতে লাগল। তারা দোকানে দোকানে ঠেলা গাড়ি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করতেই এক দোকানদার মুখ খোলে বলে ফেলল যে এটি যে কিনেছিল সে অমুক ব্যক্তি এবং মাত্র গত রাতেই সে ওটা কিনেছে। এরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তার ঘর তল্লাশী করে এবং ঐ অপরাধের সকল প্রমাণ খুঁজে পেয়ে তাকে একটু চাপ দেয়াতেই সে বিস্তারিত ঘটনা স্বীকার করে নেয়।

এ ঘটনার তদন্তের জন্য আমার উপস্থিতিটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। আল্লাহর রাজত্বে সকল কিছুই একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে চলছে। এহেন ভ্রান্ত বিশ্বাসের সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধটি আমাকে অভিহিত করণে রয়েছে, আমি যাতে আকীদা ও কুসংস্কারের বিষয় তার মূল কারণসহ পর্যালোচনা করতে পারি এবং কেন এসব কুসংস্কার বিস্তার লাভ করে? মানুষের সর্বাঙ্গে কিভাবে একেবারে বিনা বাধায় এ কুসংস্কার ঢুকে পড়ে? তবে কি ঐ কুসংস্কারের ব্যবসা যারা করে তারা, যারা ঐ কুসংস্কারের কুফলের শিকান হন তাদের চাইতে অধিক বুদ্ধিমান? এসব বিষয়ে অভিহিত হতে পারি।

যারা এসব কুসংস্কারের শিকার তারাতো লক্ষ লক্ষ। এর প্রতিকারের জন্য তারা কি ব্যবস্থা নিচ্ছে? তারা কি এ কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরতে উঠে পড়ে লেগেছে? এসবকে বিশ্বাস করছে? এসবের পক্ষ নিচ্ছে? না কি "পৌত্তলিকতা" যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বিশ্বাস আনয়নের নাম, যা বিশ্ববাসীর থায় বহু বছর ধরে চেপে বসে আছে এবং নতুন করে নিজেকে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, কতক মানুষের মানসিক দুরাবস্থা এই পৌত্তলিকতাকে ইন্ধন জোগাচ্ছে, যারা ঐ দূরাবস্থার কোন রূপ ব্যাখ্যা দিতে পারেনা।

এ অপরাধের ঘটনায় হত্যাকারী ও নিহত উভয় ব্যক্তি ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী। তারা ইসলামের শুধু নাম ছাড়া আর কিছুই জানেনা। নিহত ব্যক্তি ছিল ধোঁকাবাজ। মানুষের মধ্যে ঘৃণীত আকাঙ্খা নিয়ে চলাফেরা করত; তাদের সাথে মিথ্যে কথা বলত, সে দাবী করত যে, জিনের সাথে তার যোগাযোগ রয়েছে। সে মানুষকে সুখীও করতে পারে, দুঃখীও করতে পারে। জিনের সাহায্যে সে রোগ

দিতেও পারে আবার রোগ সারাতেও পারে। এতে মানুষের অপকারের পাশাপাশি দ্বিগুণ শিরক হয়।

অপরদিকে হত্যাকারী অধিক মূর্খতার কারণে বিশ্বাস করতো যে, তারই মত অন্য একজন মানুষ তাকে পুত্র সন্তান অথবা কন্যা সন্তান প্রসব করাতে সক্ষম। তার জন্য না হয় ওজর আছে যে, সন্তান জন্মানোর নেশায় তার জ্ঞানই লোপ পেয়েছে। কিন্তু তার আকীদা যদি সঠিক হতো তবে তাই তার মাথায় এ বিশ্বাস এনে দিত যে, আল্লাহ তায়ালা অংশীদার বিহীন। আর উপকার ও অপকারের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই হাতে এবং যদি এ বিশ্বাস তার হৃদয়ে গভীরে প্রথিত করতে পারত, তবে সে ঐ ধোঁকাবাজ এর কাছে আত্মসমর্পণ করতনা। আর সঠিক ঈমান তাকে ঐ ধোঁকাবাজের হাতে পড়া হতে রক্ষা করতে সক্ষম হতো।

অনেক সময় বিষয়টি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, কতক ধোঁকাবাজ নিজেই ঐ কুসংস্কারের পথে আহ্বানকারী সেজে বসে, এর প্রসার ঘটায়, এসবকে রক্ষা করে, উপরন্তু এসব কুসংস্কারের পক্ষে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত থাকে। আমরা এমন লোকও দেখতে পাই যারা মঞ্চে উঠে বড় বড় গলায় বর্ণনা করে যে, আজকাল যে সঙ্কটময় পরিস্থিতি চলছে, তা থেকে অমুক পীর তাকে রক্ষা করেছে। অমুক পীর যদি তার জন্য অমুক ব্যবস্থা না করত, তবে এ বছর সে এ প্রমোশন পেতনা। তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ছিল, যদি অমুক পীরের দেওয়া কবজ সে বগলে ধারণ না করত, তবে তাদের মাঝে তালাক হয়ে যেত, ইত্যাদি।

এ সময় আমার মনে পড়েছে ঐ ভদ্র মহিলার কথা যিনি কায়রো ইউনিভার্সিটি থেকে বি এ পাশ করেছেন। পরে আরও পড়াশুনা করেছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি কৃষি বিজ্ঞানে ডক্টরেট করে এখন কোন একটি আবর দেশের কৃষি মন্ত্রীর অফিসে ম্যানেজার পদে চাকুরী করছেন। ডক্টরেট করা এ ভদ্র মহিলার ঘটনা হলোঃ তার স্বামী একদিন তার নিজের বালিশের নিচে লুকানো একটা কিছু পেয়ে স্ত্রীকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। জবাবে স্ত্রী বললঃ সে এতে পঞ্চাশটির মত "জিনেইহ" (গিনি মিশরীয় মুদ্রা) রেখেছে, যেন তার হৃদয় স্ত্রীর প্রতি ধাবিত করাতে পারে। কারণ, সে কিছুদিন যাবত স্বামীল দুর্ব্যবহার লক্ষ্য করছে। কিন্তু এর ফল দাঁড়াল উল্টো। স্বামী তাকে তালাকই দিয়ে দিল। এ ঘটনার বর্ণনাকারী ঐ মহিলার উকিল স্বয়ং, যিনি তার স্বামীর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার দায়িত্ব নিয়েছেন।

কুসংস্কার ক্রমেই তুঙ্গে ওঠছে। কুসংস্কারের পন্ডিতরা যখন বিভিন্ন পীর, মাশায়েখ ও মাযারের উপকারীতা বর্ণনা করে, তখন ঐ কুসংস্কার আরও উপরে ওঠে। অমুক মহিলার মাযার যিয়ারত করা হয় অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য। অমুক পীরের মাযার যিয়ারত করা হয় রিযিকের প্রশ্নে, অমুক সক্ষম যোগ্য মহিলা অমুক মাযারের দায়িত্বশীলা। প্রেম-প্রণয়, ভালোবাসা, বিরহ-বিচ্ছেদ, তালাক ইত্যাদির জন্য অমুকের কাছে যেতে হয়। ওখানে আর এক মাযারঃ সেখানে শিশুদের রোগ, চোখের রোগ, হজমের অসুবিধা ইত্যাদি আরোগ্য হয়। এগুলো এক একটি সুপরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল ষড়যন্ত্র, যার জাল মূর্খ ও কথাকথিত শিক্ষিতদের ক্রমে ক্রমে ঘিরে ফেলেছে। তারা যেন কুরআনের এ আয়াতটি কখনও পড়েনিঃ

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ﴾

(سورة الأنعام ١٧)

"আর যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তা বিদূরীত করতে পারবে না; আর যদি তোমার কোন কল্যাণ করেন, তাহলে (কেউ প্রতিরোধও করতে পারবেনা) তিনিই তো সর্ব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতাবান।" (সূরা আল-আন'আমঃ আয়াত ১৭)

তারা যেন হাদীসখানাও শুনেনিঃ

((من تعل تميمة فقد أشرك))

অর্থঃ "যে তাবিজ পরলো সে আল্লাহর সাথে শিরক করলো।"

কুসংস্কারের কাছে নতি স্বীকার করা শুধু সাধারণ মানুষ বা তাদের মূর্খতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এর চেয়েও আফসোসের বিষয় হল যে, তা শিক্ষিত জনতা এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছে তাদের মাঝে দোর্দন্ড প্রতাপে বিরাজমান। অতএব এর আসল বিষয় হলো, সেই সকল মানুষের অন্ত রসমূহে গোপনে প্রবেশ করে, সঠিক আকিদা যাদেরকে হেফাযত করছেনা। যা তাদেরকে ঐ সব হিংস্র সর্বনাশা শিরিকী কর্মকান্ড থেকে ফিরাবে। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমানকে মজবূত করতে পেরেছে এবং মনে প্রাণে মেনে নিয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালাই সব কিছুর মালিক এবং সকল কিছুর প্রতিপালক,

তার কোন শরীকও নেই, কোন মাধ্যমও নেই, কেবল এরূপ ব্যক্তিই তার ঈমানের ছত্র ছায়ায় এবং তার আকিদার আশ্রয়ে জীবন যাপন করতে পারে। কোন অনিষ্টতা তার কাছেও আসতে পারেনা। বরং সকল অসার কুসংস্কার তার ঈমানী পাথরের উপর ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে; কিন্তু কেন? কারণ, সে তার সকল বিষয় আল্লাহরই নিকট সোপর্দ করেছে এবং তার হিসাব মতে এ সমস্যাটি এখন আর আলোচনারই বিষয় বস্তু নয়।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এবং সঠিক আকীদা পোষণ করার জন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বই-পুস্তকের প্রয়োজন হয় না; বরং তা এর চাইতেও সহজ। আমরা তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করছি- তিনি এ বিষয় দুটোকে সকলের জন্য সহজে গ্রহণযোগ্য করে দিয়েছেন, যেন কোন ফকির নিঃসম্বল হবার কারণে এসব হতে বঞ্চিত না হয়, অথবা কোন ধনী তার ধনের প্রাচুর্যের কারণে একে কুক্ষিগত করতে না পারে।

আমি যখন গভীর মনোনিবেশে এ অধ্যায়টি লিখছি ঠিক তখন হঠাৎ রাতের নীরবতা ভঙ্গ করে ঢোলের বিকট শব্দ সংমিশ্রণে এক কলরব শুনতে পেলাম। আওয়াজ বাড়তে লাগল এবং পুরো মহল্লার রাতের নীরবতা ব্যাহত করে দিল। শু বাজনার তাল বদলানোর জন্য অল্পক্ষণের জন্য ঐ বাজনা থেকে আবার পাশবিকভাবে বেড়েই উঠতে লাগলো ক্ষণে ক্ষণে। এ আওয়াজ দেয়ালসমূহ পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে উঠছে। গানের সুর এবং সাথে যে শব্দ হচ্ছে তা শুনে পূর্ব অভিজ্ঞ থেকে অনুধাবন করলাম যে, কোন ধনবতী প্রতিবেশী বছরের কোন নির্দিষ্ট দিনের বিশেষ অনুষ্ঠান করছে এবং সে অবশ্যই তার অনুরূপ জিনে ধরা রুগী-বান্ধবীদের ও দাওয়াত করেছে, যাতে তারাও তার অনুষ্ঠান দেখতে পারে। যেহেতু সে এরকম অনুষ্ঠান এবারই প্রথম করছে তা নয়; বরং সে তার শরীরে যে সব জিন বাস করছে তাদেরকেও খুশী করার জন্য প্রতি ছয়মাসে একবার এরূপ অনুষ্ঠান করে থাকে।

ঢোলের আওয়াজের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উসীলা তালাশের জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করলাম। লেখা ত্যাগ করে পড়ার চেষ্টা করলাম। ঠিক এরূপ একটা অস্বস্তি কর পরিস্থিতিতে আমার এক বন্ধু আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে চাকুরী করেন- আমাকে দেখতে এসেছেন। আমিও তাকে আনন্দ চিত্তে অভ্যর্থনা

জানালাম। কারণ, আমি তাঁর সাথে আলোচনা করে ঢোলের আওয়াজ শোনার আযাব থেকে মুক্তি পেতে চাই।

আমি প্রতিবেশীর ব্যাপারে তাঁর কাছে অভিযোগ করলাম এবং জিন ও জিনের বিরুদ্ধে মানুষের অভিযোগ, অনেক মহিলার দাবী যে, তাদের উপর জিন সওয়ার হয় এবং অসংখ্য নারী-পুরুষ যারা বছরের নির্ধারিত দিনে জিনকে খুশী করার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান করে, ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনায় প্রবেশ করলাম। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর সার্টিফিকেটধারী এ বুদ্ধিজীবি বেশ জোর দিয়েই বলতে শুরু করলেন যে, তাঁর এক সহোদরা ছিল, তাঁর ও তাঁর স্বামীর মধ্যে ঝগড়া হবার পর পরই সহোদরাকে জিনে ধরে এবং তার ডান বাহু কিছু দিন পর্যন্ত অবশ করে রাখে। ঐ জিনের উদ্দেশ্যে (ঝার)[2] অনুষ্ঠান না করা পর্যন্ত তাকে ছেড়ে যায়নি। শান্তিতে জীবন-যাপনের জন্য এক মহিলা পীর ঐ রুগী ও জিনের মধ্যে এক শান্তি চুক্তি করিয়ে দেন। এতে সে এ শর্তে তার বাহু ছেড়ে চলে যায় যে, তাকে প্রতি বছর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করতে হবে।

এ ছিল ঐ বড় আলেম ও অধ্যাপক ব্যক্তির ভাষণ। আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ঐ অসহায় ইব্রাহীম আল-হারান ও তার অশিক্ষিতা স্ত্রীর কথা ভাবছিলাম। জিনকে খুশী করার জন্য অনুষ্ঠানের ব্যাপারে একজন বড় আলেমের যে বক্তব্য; তাতে সাধারণ লোকদের কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাদেরকে কোন খারাপও বলা যায় না। ওদিকে ঢোলের প্রচন্ড আওয়াজ আমাদের কর্ণ কুহরে বিঁধছিল। ঐ অগ্নি মিশ্রিত কঠিন আওয়াজ যা পাগলপারা হয়ে জিনদের সন্তুষ্টি কামনা করছিল এবং শয়তানদের হৃদয়-মনের দয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করছিল, তার প্রচন্ডতার সামনে আমাদের অসহায় নীরবতা মূল্যহীন হয়ে পড়ছিল।

আল-আযহারের এ আলেম আমার একনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে রাত জাগা শেষ হল। যাতে আমি জ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী ভেবেছি, সে দেখি কুসংস্কার ও জিনের গল্পে বিশ্বাসীএকনিষ্ঠ বন্ধুত্ব আজ আমাকে ব্যথিত ও হতবুদ্ধি করে দিল। আমি বুঝতে পারলাম এ ভ্রান্ত আকীদা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে আলোচনা ও আমার অফিসের জানালা ভেদ করে আসা ঐ ঝার অনুষ্ঠানের ঢোলের আওয়াজের মাঝে আমার সময়টুকু অপচয় হয়ে গেল।

2। 'ঝার' অনুষ্ঠানঃ জিনে ধরা রুগী ঐ জিনকে সন্তুষ্ট করার জনে ভোগ সামগ্রী দিয়ে যে অনুষ্ঠান করে তাকেই ঝার অনুষ্ঠান বলে। অনুবাদক

ভোরে টেলিফোনের আওয়াজে জেগে উঠলাম। লম্বা লম্বা মৃদু ঘন্টা বাজছিল। এর অর্থ হল কায়রোর বাহির থেকে ফোন এসেছে। রিসিভার হাতে তুলে নিলাম। সাঈদ হতে ফোন এসেছে। যিনি কথা বলছেন তিনি হলেন আমার খালু, ইব্রাহীম আল-হারানের শ্বশুর। তিনি বললেনঃ তাঁরা আগামীকাল আমার এখানে পৌঁছবেন। আমি কায়রোতে আছি কি না, বা ভ্রমণে আছি এ ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্য ফোন করেছেন। তিনি একটি জরুরী বিষয়ে আমার সাথে কথা বলতে চাচ্ছেন। আমি তাঁকে স্বাগত জানালাম, বললামঃ আমি তাঁদেরই অপেক্ষায় আছি, এক হাজার একটা কারণে, এরূপ বলা ছাড়া আমার সামনে আর কোন উপায় ছিল না।

প্রথমতঃ যে ব্যক্তি আমার সাথে ফোনে আলাপ করেছেন আমি তাঁর জন্য পূর্ণ সম্মান ও ভালোবাসা পোষণ করি। তা ছাড়া তাঁর আওয়াজে হতাশার সুর অনুভব করলাম। হতাশ ও নিরাশ ব্যক্তির সামনে আমি স্বভাবতই একটু দুর্বল। যিনি আমার কাছে তার কোন প্রয়োজন নিয়ে আসেন এবং আমি তা মেটাতে সক্ষম; এই ধরনের ব্যক্তিকে আমি সুন্দর ব্যবহার দিয়ে ফিরিয়ে দিতে ভয় করি। আমি তাঁদের মত হতে চাই, আল্লাহ যাদের হাতে মানুষের কল্যাণ সাধন করে থাকেন,যদিও তা আমার জন্য অনেক কষ্টের ও সময় ব্যয়ের কারণ। তবুও আমি এসব কিছুই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় করে থাকি।

পরের দিন সেই বিপর্যস্থ কাফেলার সাথে আমার দেখা। কাফেলাটি ছিল আমার খালু-খালা, যিনি ইব্রাহীম আল হারানের শাশুড়ি এবং তার ঐ মেয়ে যার পুত্র সন্তান মারা যাবার পর জিনের আছর হয়েছিল। সে এমন অবস্থায় ছিল যে, তার প্রতি মায়া না হয়ে পারে না। তার মানসিক অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে ওঠেছিল। সে বিধ্বস্থ অবস্থায় ছিল। এ সময় কথাবার্তাসহ, তার আশপাশে কি ঘটেছে তা অনুভব করার ইন্দ্রিয় শক্তিও সে হারিয়ে ফেলে। নিদ্রা-অনিদ্রার মধ্যে সে কোন পার্থক্য করতে পারত না। কেউ তার সাথে কথা বলতে চাইলে সে তার জবাবও দিত না। জগত ছেড়ে সে এক খেয়ালী ও যন্ত্রণাদায়ক রহস্যময় জগতে চলে গিয়েছিল। তার চোখ গর্তে ঢুকেছে এবং সে এক হাড্ডিসার কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। কাঁচের পেয়ালার মত দুটো চোখের অর্থহীন চাউনি ছাড়া জীবনের আর যেন কোন চিহ্ন সেখানে ছিল না।

মহিলার পিতা খুবই দুঃখিত ও মর্মাহত ছিলেন। তিনি আমাকে অনুরোধের সুরে বললেনঃ আমি যেন আমার ডাক্তার ছেলের সাথে যোগাযোগ করি, যে মানসিক ও স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগের ডাক্তার এবং সে আব্বাসিয়ার স্নায়ু রোগ ও মানসিক হাসপাতালে চাকুরী করে, যাতে অসুস্থ মহিলার জন্য প্রথম শ্রেণীর কেবিনে একটি সিট পাওয়া যায়।

মাতা অর্থাৎ আমার খালা অনবরত কাঁদছিলেন। তিনি তাঁর ত্রুটি স্বীকার করেছেন। এখন তিনি লজ্জিতা। তিনি কিভাবে পীর-মুরশীদের নিকট এবং মাযারের তাওয়াফ ও কবরস্থানে দৌড়াদৌড়ির মাধ্যমে তার মেয়ের চিকিৎসা করতে অটল থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন, তা স্বীকার করেছেন। এরই সাথে রোগটাকে কঠিন হতে কঠিনতর করে তার মেয়ের শরীরের রোগ প্রতিরোধের সকল শক্তি ধ্বংস করার সুযোগ করে দিয়েছেন সে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। তিনি অকপটে এ কথাও স্বীকার করেছেন যে তিনি তাঁর মেয়ের জামাতা ইব্রাহীম আল-হারান কে ভুল পথে পরিচালিত উৎসাহিত করেছেন। তবে তাঁর ক্ষমা পাবার একটা কারণ আছে, তা হল, তিনি ছিলেন অজ্ঞতার শিকার, এক অবলা অক্ষম মহিলা। এ ছাড়া দেশ- বিদেশের মহিলাগণও তাকে জোর দিয়ে বুঝাতো যে, পীর-মুরশীদদের সাথে তাদের যে অভিজ্ঞতা তা তাদের সফল অভিজ্ঞতা। প্রবাদ আছেঃ "ডাক্তারকে জিজ্ঞেস না করে বরং যিনি অভিজ্ঞ তাকে জিজ্ঞেস কর।"

আল্লাহর অনুগ্রহে তার জন্য একটা সিট পেলাম এবং ঐ দিনই তাকে প্রথম শ্রেণীর কেবিনে ভর্তিও করতে পেরেছিলাম। আমার ডাক্তার ছেলে জানালঃ তার রুগীর অবস্থা ভাল; উদ্বিগ্ন হবার কারণ নেই। রোগ বেড়ে যাবার মূল কারণ ছিল অবহেলা। এরপর এক সপ্তাহ চিকিৎসা গ্রহণের পর ভদ্র মহিলা সেরে ওঠেন। তাকে বৈদ্যুতিক সেক দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। এর পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়।

এর ফাঁকে ইব্রাহীম আল-হারান আমার সাথে যোগাযোগ করেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলাম যে একটি জরুরী প্রয়োজনে আমি তাকে চাই। সে যেন অবশ্যই বাড়িতে আমার সাথে দেখা করে। সে যখন এল আমি তাকে পুরো ঘটনা বিস্তারিতভাবে খুলে বুঝালাম। তাকে বললামঃ ডাক্তারগণ বলেছেনঃ সে যে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়েছে এটাও তার স্ত্রীর চিকিৎসার একটা বিরাট অংশ। কিন্তু সে তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললো যে আমি ডঃ জামিল গাজির নিকট

থেকে 'তাওহীদ' বিষয়ক যে বইটি তার জন্য এনেছিলাম তা পড়ার পর থেকে সে এক নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে। ইতিপূর্বে তার মুখে কথায় কথায় কখনও কুরআন শরীফের কসম, কখনও বা নবীদের কসম, আবার কখনও বা কোন পীর বাবার নামে কসম এসে পড়ত। এখন তা আর মোটেই নেই। এখন সে এমন ব্যক্তির ন্যায় জীবন-যাপন করা শুরু করেছে, যিনি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করে না, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না, আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে কিছু আশা করে না।

শেষ পর্যন্ত আমি যখন তাকে তার বউকে ফিরিয়ে নেওয়ার কথা বললাম তখন সে ফিরিয়ে নেওয়ার সাথে একটা শর্ত আরোপ করে বসল, যে তার শ্বশুর ও শাশুড়ি যেন তাদের পুরানো ভ্রান্ত আকিদা পরিহার করে। ওদিকে তার স্ত্রী সম্পর্কে বলে উঠলঃ সে তার ব্যাপার বুঝবে। এ সময় তাদের নিয়ে আমি একটা বৈঠক করে ফেলি। এখানে তার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ বাদ পড়ল না, কারণ তখনও তার স্ত্রী হাসপাতালে। এরূপ কঠিন শিক্ষা পাবার পর শ্বশুর-শাশুড়ি তার এ শর্তটি মেনে নিল।

স্ত্রীকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়াও তার স্ত্রীর রোগ মুক্তির বড় কারণ ছিল। আর যখন তার স্ত্রী জানতে পারল যে স্বামী তাকে পুনঃ স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে ফিরিয়ে নিয়েছে, এতে তার খুশী আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমার যে ছেলে তার চিকিৎসার তদারকি করছিল সে আমাকে বললঃ তার স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়া এবং তার স্বামী তাকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়াই ছিল তার আসল চিকিৎসা, যা তার সুস্থতাকে ত্বরান্বিত করেছে। কারণ সে ছিল তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। তার পুত্র মারা যাওয়ার শোক তাকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছিল। তার যতটুকু জ্ঞান বাকী ছিল, তার তালাকের ঘটনা সেটুকুও শেষ করে দিয়েছিল। একমাস দশদিন পর তার হাসপাতাল ছেড়ে বের হবার দিন ধার্য হয়েছিল ছিল। ঐ সময় দরজায় দাঁড়ানো গাড়িতে তার স্বামী, বাবা ও মা তার জন্য অপেক্ষা করছিল। গাড়ি তাদের সকলকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ সাঈদ এর পথে রওয়ানা হয়ে গেল।

আমি দুঃখের এ করুণ কাহিনীর রেখা আমার অন্তর হতে মুছে ফেলতে পারিনি। কুসংস্কার প্রতিদিন প্রতি পলে-পলে আমার স্বজাতি ও আমার ধর্মের অনুসারীদের এমন কি ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র শত শত আত্মা ও সংসার নষ্ট করছে অথবা ধ্বংস করছে, তা হতে আমি গাফেল থাকব তাও তো সহজ ছিল না। এমতাবস্থায় আমি নিজেকে প্রশ্ন করছিলামঃ আমরা যারা মধ্যপ্রাচ্যে বাস করছি, কেন কুসংস্কার আমাদের আকিদাকে তিলে তিলে নষ্ট করছে এবং নিজস্ব

সংস্কৃতি, বিদ'আত ও অনৈসলামিক কার্যকলাপকে ফলাও করে তুলে ধরা হচ্ছে, যা সভ্যতার অনুশীলন ও আচার-অনুষ্ঠান হতে আমাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবে?

পশ্চিমা দেশগুলো এবং ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থাসমূহ ও তো কুসংস্কার মুক্ত নয়, আর কল্প কাহিনী হতেও খালী ; এতসব সত্বেওতারা নিজস্ব একটি সভ্যতা নিয়ে জীবন-যাপন করছে এবং দৈনন্দিন জীবনে তা অনুশীলন করছে। তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি দিন দিন তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তারাও এসবের মাধ্যমে সম্মুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আসলে তাদের কল্প-কাহিনী ও কুসংস্কারসমূহ পুরোটাই 'রূহ' এর বিপরীত, তা যতটা বস্তুবাদের দিকে নিয়ে যায় তার চেয়েও বেশি নিয়ে যায় পদস্খলনের দিকে। আর এটাই তাদের সভ্যতার মূল বিষয়বস্তু।

অপরদিকে প্রাচ্যের দিকে দেখুন, এখানে দেখবেন যে আমাদের যে কুসংস্কার তা সরাসরি জ্ঞান ও বস্তু বাদ উভয়টিরই বিপরীত। এ কারণেই বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আমাদের জীবন ধ্বংসের জন্য আমাদের সমাজের কুসংস্কারই মূলতঃ দায়ী হবে।

এখন আমাদের সামাজিক ও সভ্যতাগত কানা-গলি থেকে বের হবার একমাত্র উপায় হলো আকিদা ও বিশ্বাসের সাথে যেসব বিদ'আত জুড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তা আকিদার সাথে মিশে আছে, অথচ ধর্মের বিপরীত। এমন সব কিছু থেকে আমাদের সকলের আকিদাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেয়া উচিত।

'তাওহীদ' যখন হবে জীবনের ব্রত, নিজস্ব সংস্কৃতি সর্বোপরি আকিদা এবং বিশ্বাস যখন দৃঢ়ভাবে ধারণ করবো, ঠিক তখনই অতি দ্রুত ও চিরতরে আমাদের জীবনের আকাশ হতে কুসংস্কারের কাল মেঘ, ধোঁকাবাজি, খেল-তামাশা এবং ভিত্তিহীন গণক বচন দূরীভূত হয়ে পড়বে।

এটি এমন একটি দায়িত্ব যা প্রশিক্ষকগণ সরাসরি অথবা কোন উপায়ে পালন করতে পারেন। মনে রাখবেন, আমরা যে ত্রুটিপূর্ণ পরিবেশের শিকার তা এহেন স্বীকারোক্তিসমূহে যা পড়লেন, তার চাইতে অনেক বেশি খারাপ। আপনি যদি শুধু পরীক্ষার জন্য অনির্ধারিতভাবে একশতটি পরিবার বেছে নেন এবং সমীক্ষা চালান তবে দেখতে পাবেন যে, এ স্বীকারোক্তিসমূহে যা আপনাদের সামনে বর্ণনা করেছি তা নিতান্তই কম।

﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلَتْ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ (سورة آل عمران ٥٣)

অর্থঃ "হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা ঈমান এনেছি তার প্রতি যা আপনি নাযিল করেছেন, আর আমরা শেষ রাসূলের আনুগত্য করেছি। সুতরাং আমাদেরকে তাদের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করুন, যারা সমর্থনকারী। (সূরা আল-ইমরান আয়াত ৫৩

---------------o---------------

ভূমিকা

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি সকল সৃষ্টির প্রতিপালক এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক একত্ববাদীদের ইমামের প্রতি, তাঁর বংশধর ও সাহাবাগণের প্রতি, তিনি আমাদের নবী মুহাম্মাদ, যাঁকে আল্লাহ তায়ালা বিশ্বজগতের জন্য করুণা হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

এ পুস্তিকায় কয়েকটি পুণ্যময় অধ্যায় রয়েছে যা এক ব্যক্তির অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন কাটানোর পর হেদায়াত পাওয়ার ঘটনা বর্ণনায় সমৃদ্ধ। যিনি তাওহীদ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, কুসংস্কারের অন্ধকার পথে চলাফেরা করতেন, কবর-মাযার হতে বরকত ও ফয়েজ গ্রহণের চেষ্টা করতেন, ওসবে হাত বুলাতেন, মাযারের চার পাশে তাওয়াফ করতেন। আল্লাহ তায়ালা অবশেষে তার প্রতি অনুগ্রহ করে আলোর পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সরল পথই প্রদর্শন করেন।

এ অধ্যায়গুলো 'আত্তাওইয়াতুল ইসলামিয়া' সাময়িকীতে লিখেছিলাম যা হজ্জ বিষয়ক সংস্থা প্রকাশ করেছিল। এ বরকত ও পুণ্যময় এবং মনোমুগ্ধকর অধ্যায়গুলো সুনিপুণ কথাশিল্পী শ্রদ্ধেয় উস্তাদ 'দারুল হিলাল' পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল মুন'এম আল-জাদাভীর প্রাঞ্জল বর্ণনা, যা বহু মানুষের হৃদয়ে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছে।

এ অধ্যায়গুলো সকল মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যেন তারা আলো ও হিদায়াতের পথ চিনতে পেরে তা অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। পাশাপাশি বক্র পথ ও ভ্রষ্ট পথ চিনতে পেরে যেন তা পরিহার করতে পারে।

একমাত্র আল্লাহই সোজাপথ প্রদর্শনকারী, তিনিই আমাদের সর্বোত্তম সহায়ক।

- প্রকাশক

اعترافات

(كنت قبورياً)

ألفه: عبد المنعم الجداوي

ترجمه إلى البنغالية: محمد أفلاطون حسين

راجعه: محمد مكمل الحق